SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

প্রসঙ্গ দেশভাগ ও বাংলা ছোটোগল্প / Partition and Bengali short stories

অমরেশ মিত্র
সহকারী অধ্যাপক, কাঁচরাপারা কলেজ, বাংলা বিভাগ

ORCID -
https://orcid.org/0009-0005-7701-5176Previewpublicrecord
e-mail -amaresh.ju888@gmail.com
Received Date- 25.12.2025
Selection Date – 24.01.2026
Page- 137-147

Keywords
ভারতবর্ষ,
পাকিস্তান,
হিন্দু,
মুসলমান,
দেশ ভাগ,
রাষ্ট্র,
সাধারণ,
পালঙ্ক, অঙ্গার,
দুকূলহারা,
সর্বস্বান্ত,
উদ্বাস্তু।

Abstract

On august 15, 1947, independentIndia appeared on the world map, bearing the wounds of partition in body and mind. It was like a country with clipped wings. One of the main causes of partition was religion; Based on religion, separate states were formed for Muslims in both the eastern and western parts of India. Partition was the realistic impact of state leaders gaining state power, selfishness, conspiracy, and plotting. As a result of the partition, common minority people of both countries were forced to leave their ancestral homelands, becoming helpless and destitute, moving to a different country merely out of self-defense and the necessity to survive. The tragic tales of the life struggles of these uprooted refugee people in the post-partition era have been described in the abundant literature written during this time. SHORT STORIES ARE PROMINENT AMONG THEM. Relying mainly on four short stories, we will attempt to show in this essay the overall picture of uncertainty, insecurity, helplessness, and the total destitution in the lives of common people who left their country in the post-partitions period.

Main Discussion

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

প্রায় দুশো বছর পর ব্রিটিশ শক্তি তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপনিবেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। ১৯৪৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন দুই দেশের আত্মপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু এ কোন্ ভারতবর্ষ? ডানা ছাটা বিধ্বস্ত এক ভঙ্গুর দেশ। এই দেশ বিভাগের জন্যই কেবলমাত্র ব্রিটিশরাই দায়ী ? ধর্মের মধ্যে ভেদাভেদ ঘটিয়ে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আত্মস্বাদ করার জন্য যারা হীন চক্রান্তে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদের কি দেশ ভাগের কোনো ভূমিকা নেই? আর যারা সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় আজন্মের স্বদেশ ভূমিকে ছেড়ে এক অপরিচিত, অজানা দেশে চলে যেতে বাধ্য হল? যারা ছিন্নমূল অবস্থায় শুধু মাত্র টিকে থাকার জন্য ভিন্ন দেশে উদ্বাস্তু হয়ে যাযাবরে পরিণত হল, যাদের জীবনে দেশ ভাগ অকাল কালবৈশাখির ঝড়ের মত তাদের অকাল মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করল, এই লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে আকস্মিক বিপর্জয়ের জন্য দায়ী কে?

ধর্ম ও সংস্কার পৃথক হলেও হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষ দীর্ঘ আটশো বছর পাশাপাশি বাস করেছে। তাদের মধ্যে সংঘাত ও বিবাদ ঘটে নি, এমন নয়। সাধারণভাবে জীবন-যাপনের জন্য, আত্মরক্ষার তাগিদে তারা পরস্পর কাছাকাছি এসেছে বাস করেছে চির পরিচিত আত্মীয়ের মতো। এক শ্রেণীর মানুষের ষড়যন্ত্র, স্বার্থপরতা ও ক্ষমতা লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা এই শান্ত, নিরুপদ্রব ও নিস্তরঙ্গ জীবনে নিয়ে এল, ধর্মীয় বিভাজন ও দ্বিজাতি তত্ত্বের বীজ। ফলে, হাজার-হাজার সাধারণ দরিদ্র অসহায় মানুষের বিশ্বাসের মূলে ছড়িয়ে দেওয়া হল, এই দ্বিজাতি তত্ত্বের বীজ। এর ফলশ্রুতি, ১৯৪৬ সালে কোলকাতা ও নোয়াখালির ভয়াবহ ধর্মীয় দাবানল।

ধর্মীয় বিভাজনকে সামনে রেখে বাংলা ভাগ, লক্ষ লক্ষ মানুষের উদ্বাস্তু হয়ে পরা, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য উদ্বাস্তু মানুষের প্রাণপণ জীবন সংগ্রাম, হাজার-হাজার মানুষের অকাল মৃত্যু ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রভৃতি বাস্তব ঘটনাকে আশ্রয় করে রচিত হল বিচিত্র ও বহুমুখী বাংলা সাহিত্য। এই সাহিত্যের ক্ষুদ্র একটি অংশকে স্পর্শ করে, এই প্রবন্ধের অবতারনা। আমরা এই প্রবন্ধে প্রধানত চারটি বাংলা ছোট গল্প অবলম্বনে আমাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করব।

দেশ ভাগ পরবর্তি সময় উভয় বাংলায় দেখা দিয়েছিল ভয়ানক উদ্বাস্তু সমস্যা। আর এই ঘটনার বাস্তব অভিঘাতে, বাংলা সাহিত্য বিচিত্র ও বহুমুখি ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে এই সাহিত্যিক ধারার অন্যতম একটি বাংলা ছোটো গল্প। "পালঙ্ক", "একটি তুলসী গাছের কাহিনী", "অঙ্গার" ও "দুকূল হারা"। এই চারটি গল্প আমাদের আলোচনার মূল বিষয়। ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহে, সমকালীন সামাজিক পটভূমিকায়, উদ্বাস্তু সমস্যা কী ভীষণ ও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল তা ক্ষুদ্র পরিসরে এই প্রবন্ধে ধরার চেষ্টা করা হল ।

সমকালীন সময়ের বাস্তব সামাজিক অভিঘাত, ভৌগলিক মানচিত্রের বিন্যাস, আজন্ম মাতৃভূমিকে ছেড়ে, ছিন্নমূল অবস্থায়, নতুন দেশের অন্বেষণ। এই সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহকে কোনো লেখকই অগ্রাহ্য করে চোখ ফিরিয়ে রাখতে পারে না। সাধারণ মানুষের আকস্মিক এই করুণ পরিনতি, লেখকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে সাহিত্যের পাতায়, ছোটোগল্পরূপে। এই দেশ ভাগের বিভিন্ন অভিঘাত, বিভিন্ন লেখকের

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

মনে কিভাবে সামাজিক প্রতিফলন, সামাজিক প্রতিক্রিয়া ও সার্বিক সহানুভূতির জন্ম দিয়েছিল, তার একটি সামগ্রিক মানচিত্র নির্মাণের চেষ্টায়, এই প্রবন্ধ।

"পালঙ্ক", "নরেনদ্রনাথ মিত্র"

এই গল্পের কাহীনি একটি পালঙ্ককে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও, এই গল্পের মূল পটভূমিকায় রয়েছে, আসন্ন দেশ ভাগের ভয়াবহ ও করুণ ঘটনাবলির ধারাবাহিক প্রবহমানতা। এই গল্পের নাম পালঙ্ক, গলপের প্রধান চরিত্র পালঙ্ক, গল্পের মূল কাহিনী পালঙ্ককে আশ্রয় করে বিস্তারিত হয়েছে। কিন্তু একটু ভালো করে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, গল্পের কাহিনীর মধ্যে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হয়েছে দেশ ভাগের প্রসঙ্গ। পুর্ব বঙ্গের শান্ত স্নিগ্ধ ও প্রকৃতি ঘেরা পরিবেশ, এক দল রাজনৈতিক নেতাদের পরামর্শে, রক্ষশীল এক দল ধর্মীয় নেতাদের অতি সক্রিয়তায় ও এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষি মানুষের লোভ ও আকাঙ্ক্ষার আগুনে কিভাবে দগ্ধ হল। গ্রামের গ্রাম্য পরিবেশ, সহাবস্তানের সম্পর্ক ধর্মীয় বিভাজনের ফলে, হিন্দু ধর্মের মানুষের কাছে বিভীষিখাময় হয়ে উঠল। পাকিস্তান রাষ্ট্র, কিভাবে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর হয়ে দাড়াল। তারই পূর্ণাঙ্গ বিবরণে পরিপূর্ণ এই ছোটোগল্পটি রাজমোহন রায়, পুর্ব বঙ্গের একজন সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ, তার পুত্র দেশ ভাগের আগেই তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে চাকরির অছিলায় কোলকাতায় চলে গেছে। পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর, অসংখ্য হিন্দু ধর্মের উচ্চবর্ণের সম্ভ্রান্ত মানুষ,তাদের বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি বিক্রি করে, অথবা ফেলে রেখে, নিরাপত্তার কারণে, শুধু মাত্র বেঁচে থাকার জন্য, নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। রাজমোহন রায়, সে পথের পথিক নন। তার পুত্র তাকে কোলকাতায় নিয়ে যেতে চেয়ে ছিল, পুত্রবধু অনেক অনুরোধ করেছিল, নাতি-নাতনির কাতর দৃষ্টি তাকে তাদের সঙ্গে যেতে আকৃষ্ট করেছিল, অথচ রাজমোহন রায় সমস্ত আবেদন ও আকুতিকে অবলীলায় অস্বীকার করতে পেরে ছিলেন। তার কারণ, দেশের প্রতি ছিল তার অকৃত্রিম ভালোবাসা, মানুষের প্রতি ছিল অগাধ আস্থা, জায়গা-জমির প্রতি প্রবল মমতা ও প্রতিটি জিনিসের প্রতি অপরিমিত প্রেম। তিমি সেই দুর্দিনে তার জায়গা-জমি বিক্রি করা তো দূরের কথা, এক গাছা খড় পর্যন্ত বিক্রি কতে রাজি ছিলেন না। এই সব কিছুকে ঘিরে ছিল, তার আবাল্য মধুর ও জীবন্ত স্মৃতি। প্রতিটি গাছ ও লতাপাতায় জরিয়ে আছে, স্বপ্ন লালিত অফুরন্ত স্মৃতি। তার বাড়ীর পুর্বের ঘরটি নির্দিষ্ট ছিল তার পুত্র ও পুত্র বধুর জন্য পুরবের ঘরে পুর্ব দিকের দেয়ালে তার পুত্র ও পুত্র বধুর ছবি, দক্ষিণের দুটি জানালা জুড়ে আছে তাদের ব্যবহারের পালঙ্ক। খুব স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন জাগে, পুর্বের এই ঘরটিকে তিনি এইভাবে আগলে রাখতেন কেন? প্রতিদিন ছবি ও পালঙ্কের গায়ের জমে থাকা ধূলো ঝারতেন কেন? শুধু কি তার পুত্রের প্রতি ভালোবাসার জন্য, পুত্রদের স্মৃতি অমলিন রাখার জন্য, কোনো আকস্মিক ঘটনা এই স্মৃতিকে ধূলোর মতো আচ্ছন্ন করতে না পারে, শুধু কি তার জন্য। পুত্র ছিল, তার সূর্য, বলা ভালো জীবন সূর্য। সেই সূর্যের আলোয় তিনি সমস্ত জীবনকে আলোকিত করতে চেয়েছিলেন। সেই সূর্য আজ অস্তমিত। তার জীবনকে অন্ধকারে ভরিয়ে শুধু স্মৃতির আশ্রয়ে রেখে,

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

তারা পরপারে। দেশ ভাগ, পাকিস্তান রাষ্ট্রের গঠন, মানুষের আস্থা ও আচরণের পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি ছিলেন উদাসীন। আর তাই মগবুলের মতো একজন কামলা মজুর মাত্র পঞ্চাশ টাকায় পালঙ্কটা কিনলেও তার মনে হয়েছে। "শালার বুইড়্যা কী আইচ্ছা বজ্জাইত, চৌকিদার, মানুষ নয় যম। যক্ষের ধনের মতো সব আগলাইয়া রইছে। এ তো হিন্দু চইল্যা গেল, ও বুইড়্যার যাওনের নাম নাই।।। আরে চোখ বোঝলে খাবো তো আমরাই থাকবো তো আমরাই।।। বুইড়্যার বাড়ী আমি খাস পাকিস্তান বানাবো। আমার পোলাপান, আমার কোবিলা উহার ঐ শান বাধানো ঘরের ভিতর দিয়া নইড়্যা চইড়্যা বেড়াবে।।। এই খাট আমি এমনি পাইতাম, কাইড়্যা নিতাম বুইড়্যার কাছ থেইক্যা।"[১]

ধলাকর্তা পুত্র বধুর চিঠি পড়ে অপমানিত ও অসম্মানিত হয়েছিলেন। তার পুত্র বধু জানতেন যে, বৃদ্ধ রাজমোহন রায় তার জায়গা জমি বিক্রি করে কোলকাতায় যাবেন না। তিনি তাদের কোনোভাবে সাহায্য করবেন না। আর সেই কারণে, পুত্র বধূ অসীমা, তার বিয়ের সময়, বাপের বাড়ী থেকে পাওয়া, রাজমোহনের বাড়ীতে রক্ষিত পালঙ্কটা বিক্রি করে, টাকা পাঠাতে বলেছিল। কোলকাতায় অত্যন্ত কষ্টে ও অভাবে তাদের দিন কাটছে। এই পালঙ্ক বিক্রির টাকায়, তারা একটি চৌকি কিনবে বলে চিঠিতে তার পুত্র বধূ ও পুত্র জানোয়েছিল এই প্রস্তাব ছিল রাজমোহনের কাছে অপমানজনক। আর সেই কারণে, রাগের বসে, মাত্র পঞ্চাশ টাকায় মগবুলকে পালঙ্কটা দিয়ে দেওয়ার পরে, বারবার মগবুলের কাছে টাকা ফিরিয়ে পালঙ্কটা ফিরিয়ে নিতে চেয়েছে। পাঁচ টাকা এমন কি, দশ টাকাও বেশি দিতে চেয়েছে। মগবুল রাজি হয় নি। গ্রামে শালিসি সভা বসালেও মগবুলকে রাজি করানো যায় নি। গেদু মুনসি ও সজন মৃধার মতো মুসলমানরা মগবুলকে শাসনের নামে প্রশ্রয় দিয়েছে এই প্রসঙ্গে শরৎ শিল বলেছে। "সব মিঞারা এক জোট হইছে, বুঝলেন ধলাকর্তা। তলে তলে সকলেরি সায় আছে। নইলে মগবুল মিঞার সাধ্য কী, আপনার মুখের উপর বলে, এ বিচার মানব না। চুপ কইর্যা থাকেন ধলাকর্তা, সইয়া যান সইয়া যান। আপনার তো একখানা খাট, বাড়ী-ঘর-জমি-জোত, কত লোক জলের দরে বিকায়া দিয়া গেছে না। তাতে কী হইছে, তাতে কী তারা মইর্যা গেছে? মরে নাই, আপনি একখানা খাটের জন্য মইর্যা যাবেন না।"[২] রাজমোহন রায়, মগবুলের এইরকম আচরণ আশা করেন নি। তিনি মগবুলকে বিপদে ফেলার জন্য, তার কাছ থেকে দুধ নেওয়া বন্ধ করে দেন। তার বাড়ীতে মগবুলের মজুরি খাটা বন্ধ হয়ে যায়। গ্রামের এক দল মুসলমান জলের দামে হিন্দুদের জায়গা জমি কিনে বড়ো লোক হয়ে ওঠে। তারা তাদের কৌলিন্য ও আভিজাত্য বৃদ্ধির গোপনে মগবুলের কাছ থেকে পালঙ্কটা কিনতে চায়। কিন্তু মগবুল কিছুতেই তার পালঙ্কটা বিক্রি করতে চায় নি। এ ছিল তার "পুরুষের ত্যাজ" তাই ফতেমাকেও বলতে শোনা যায়। "শুনি এখন আমাগো পাকিস্তান, আমাগো রাজত্ব, আমরা না খাইয়া মরবো ক্যান?"[৩] এক শ্রেণীর বহিরাগত মানুষ, ধর্মকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে, হিন্দু মুসলমানের দীর্ঘ দিনের শান্ত ও আন্তরিক সহাবস্তানের সম্পর্ককে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। অথচ মনে রাখতে হবে, সাধারণ দরিদ্র মানুষের জীবনের কোনো পরিবর্তন আসে নি, শুধু ধর্মীয়

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

উন্মাদনা ছাড়া। পাকিস্তানের মতো রাষ্ট্র এক শ্রেণীর মুসলমানকে প্রভুত সম্পদশালী করেছিল সত্যি। সাধারণ মানুষের জীবনে তার কোনো ঢেউ লাগে নি। মগবুলের কথায়, "আমাদের হিন্দুস্তানও নাই, পাকিস্তানও নাই। আছে শুধু গোরোস্তান।"[৪]

অঙ্গার

এই গল্পটির প্রেক্ষাপটে রয়েছে দেশ ভাগ, দেশ ভাগের ফলে সাধারণ মানুষের ছিন্নমূল অবস্থা, মানুষের জীবনে দারিদ্র ঋণ অভাব। অসহায় নিঃসম্বল মানুষ চির পরিচিত জন্মভূমিকে ছেড়ে, একটি নতুন দেশে উদ্বাস্তুতে পরিণত হওয়ার করুণ কাহিনী। গল্পের কথক আত্মকথন রীতিতে গল্পের কাহিনীকে বর্ণনা করেছেন। কথক দিল্লিতে থাকলেও তার পিসির বাড়ী ছিল পূর্ববঙ্গের ফরিৎপুরে। তাদের আর্থিক অভাব থাকলেও সম্ভ্রম ও সম্মান ছিল, তাদের জীবনের পাথেয়। দেশ ভাগের ফলে, ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য, তাদের আজন্ম মাতৃভূমিকে ত্যাগ করে, বউবাজারের ৩১৩এফ নম্বর বাড়ীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। পূর্ববঙ্গের প্রকৃতির মতো সরল সাধারণ নিস্তরঙ্গ মানুষের জীবনে দেশ ভাগের ভয়াবহতা কী ভীষণ সুনামি এনেছিল। তাদের আজন্ম লালিত ভাবনা, স্বপ্ন, ঐতিহ্য ও আত্মসম্মান কী নিষ্ঠুরতায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছিল, তারই বাস্তব বিবরণের কাহিনী এই গল্পটি।

আগেই বলেছি, কথকের পিসিমার বাড়ী ছিল পূর্ব বঙ্গের ফরিৎপুরে। দুই ছেলে ফুটু ও হারু এবং এক মেয়ে মুনুকে নিয়ে তাদের সংসার। বড়ো মেয়ে সুমনা অসময়ে তার স্বামীকে হারিয়ে, শিশু পুত্রকে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে আসে। এই শিশু পুত্রকে বড়ো করা, তাকে মানুষের মতো মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সে কথকের কাছে অর্থ সাহায্য চেয়েছে। তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এই দুঃসময়ে ছেলেটিকে যথাযথভাবে বড়ো করা। কিন্তু দেশ ভাগ, সাম্প্রদায়ীক দাঙ্গা ও যুদ্ধ পরিস্থিতি, সুমনার মতো একজন মাকে, তার শিশু পুত্রকে শ্বশুর বাড়ী রেখে স্বপরিবারে নিজের দেশ ছেড়ে একটি ভিন্ন দেশে চলে আসতে হল। এ যেন স্বর্গীয় পরিবেশ ছেড়ে স্বশরীরে নরক দর্শন। তারা কোলকাতায় এসে আশ্রয় নেয়, বৌবাজারের একটি ঘিঞ্জি বাড়ীতে, বাড়ি নয়, পতিতা পল্লী। কোলকাতায় এসে ফুটু, কারখানায় কাজ নিলেও মাদকাশক্তিতে আসক্ত হয়ে, সে বাড়ীতে আসা বন্ধ করে। ছোটো ভাই হারু, চায়ের দোকানে কাজ করলেও, সংসারের অনটনের কারণে খাবার চুরি করে কাজ হারায়। ছোটো বোন মিনু, আট আনার জন্য দিনে রাতে দেহ বিক্রি করে, হরিষবাবু খগেনবাবুর কাছে। আর সুমনা, বাড়ীতেই দেহ ব্যবসা শুরু করে। শুদ্ধাচারি পিসিমা, নিরামিষ আহারে অভ্যস্ত পিসিমা, পরিবারের প্রধান পিসিমা ও দয়া-মায়ায় পরিপূর্ণা পিসিমা, পেটের জ্বালা প্রশমিত করার জন্য, পেটের মেয়েদের দেহ ব্যবসায় নামিয়ে, দেহ ব্যবসার টাকায় খাবার সংগ্রহ করে শুধু মাত্র টিকে থাকার জন্য টিকে আছে। এ যেন একটি পরিবারকে নিশ্চিত নিরাপত্তার চির অভ্যস্ত পরিবেশ থেকে, টেনে বের করে আনার কাহিনী। গল্পের কথক, নলীনাক্ষ, পিসিমাদের এই এই ঘৃণ্য জীবনকে

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

সহজভাবে মেনে নিতে পারে নি। সে সুমনা বলেছে, "শোভা, এটা তো মানিস, সামনে আমাদের চরম পরীক্ষার দিন। চারিদিকে এই ধ্বংস চক্রান্তের মধ্যে আমাদের টিকে থাকতেই হবে। যেমন করেই হোক, নিজেদের মান সমভ্রম বাঁচিয়ে।"[৫] অসহায় নিরন্ন ও সর্বহারা মানুষের কাছে, এই নৈতিক বাক্য শুধু অমুলক নয়, অগ্রহণ যোগ্য বটে। তাই সুমনা বলে, "মান সমভ্রম, কোথায় মান কথায় সমভ্রম ছোড়দা, আগের বুকের আগুন নিয়ে ছিলাম সবাই, এবার পেটের আগুনে সবাই খাক হয়ে গেলুম। কে বলেছে প্রাণের ছেয়ে মান বড়ো? কোন্ মিথ্যেবাদী রটিয়েছে, আমাদের বুক ফাঁটে তো মুখ ফোটে না। ছোড়দা তুমি কী বলতে পারো, যদি তিল তিল করে না খেতে পেয়ে মরি। যদি পোড়া পেটের জ্বালায় ভগবানের দিকে মুখ খিঁচিয়ে আত্মহত্যা করি, যদি তোমার মা বোনের উপবাসী বাসি মরা,ঘর থেকে মোদ্যফরাসে টেনে বার করে, সে দিন তোমাদের মান সমভ্রম বাঁচবে? যারা আমাদের বাঁচতে দিল না,যারা মুখের ভাত কেড়ে নিয়ে আমাদের মারলে,যারা আমাদের বুকের রক্ত চুষে চুষে খেলে,তাদের কী মান সমভ্রম পৃথিবীর ভদ্র সমাজে কোথাও বাড়ল?"৬ কথকের পিসিমা, কথকের বোন কোন্ পরিস্থিতিতে গ্রাম্য গৃহ বধূ থেকে বারাঙ্গনায় পরিণত হল, কোন্ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা দেহ ব্যবসার জীবিকা গ্রহণ করল, কাদের প্ররোচনায়, পতিতা পল্লীতে ঘিঞ্জি আবর্জনার সংকীর্ণ ঘরে তাদের জীবন সীমাবদ্ধ হল, গল্পের কথকের কাছে সে প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই জানি। গল্পে উল্লেখিত কথিত মাস্টার সাধারণ মানুষের এই দুর্বিসহ অবস্থা সম্পর্কে বলেছে, "এই দুর্ভিক্ষে চারটে অবস্থা দেখলুম, বুঝলে বিনোদ। আগে ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে, যদি দুটো চাল পাওয়া যায়,তারপর হল ভাঙা কলায়ের থালা, যদি চারটে ভাত কোথাও পেলে। তারপর হাতে এলো হাঁড়ি, যদি কেউ একটু ফ্যান দেয়। আর এখন কেবল কান্না, কেউ কিছু পায় না।"[৭] অঙ্গার গল্পটি দেশ ভাগের ফলশ্রুতিতে সাধাণর মানুষের আত্মহননের গল্প। যুদ্ধের আগুনে, দাঙ্গার অনলে পেটের দহন জ্বালায় পিসিমার পরিবারের মতো সাধারণ মানুষের জীবন কী দুর্বিসহ যন্ত্রণা সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিল, তারি অনুলিপিত রূপ এই গল্পটি।

দুকূল হারা

এই গল্পে লেখিকা প্রতিভা বসু, পূর্ব বঙ্গের একটি স্বচ্ছল পুরুষহীন পরিবারের মর্মান্তিক কাহিনীকে তুলে ধরেছেন। এই একটি কাহিনীর মধ্য দিয়ে দেশ ভাগ পরবর্তী, পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেশ ভাগের ফলে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। পূর্ব পাকিস্থানের সংখ্যা লঘু হিন্দুরা নিরাপত্তার কারণে, বেঁচে থাকার জন্য, আজন্ম পরিচিত স্বদেশভূমি ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে আসে। এই গল্পে লেখিকা যে পরিবারটির কথা বলেছেন, তাদের নিরাপত্তার অভাব, জীবনের আশঙ্কাও প্রাত্যহিক আতঙ্ক থাকলেও, তাদের পক্ষে পূর্ব পাকিস্থান ছেড়ে চলে যাওয়া সম্ভব ছিল না। বিন্দুবাসিনীবিধবা বৃদ্ধা, তার পুত্র নিরদবরণ মা স্ত্রী ও দুই কন্যাকে রেখে মারা গেছে। ফলে, পুরুষহীন পরিবারে দেশ ত্যাগের পরিকল্পনা দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার জন্ম দেয়। আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলেও তারা বারংবার দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও , সেই সিদ্ধান্ত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। তার একমাত্র কারণ, তাদের পরিবারে কোনো পুরুষ ছিল না। বিন্দুবাসিনীর জমিদারির

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

অন্যতম মুসলমান প্রজা, জামির শেখের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস ও ভরসার উপর নির্ভর করে তারা পূর্ব পাকিস্থানে থেকে গিয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রময় এই সংবাদ ছড়িয়ে পরে যে, হিন্দুদের আর ভারতবর্ষের যেতে দেওয়া হবে না, তাদের গুম করে খুন করা হবে, তখন আর হিন্দুদের পক্ষে নিশ্চিন্তে পূর্ব পাকিস্থানে থাকা সম্ভব ছিল না, যেমন ছিল না বিন্দুবাসিনীর পক্ষে। বিন্দুবাসিনী জামির শেখের শরণাপন্ন হলেও, জামির শেখের পক্ষেও তাদের আশ্রয় দেওয়া সম্ভব ছিল না। সে জানিয়েছে, "মাগো, বাইরে থেক্কা যে বড়ো বড়ো মিঞা আইছে দ্যাশে, তারা মারামারি করতে কয়, লুটপাট করতে কয়, কইতে শরম লাগে, কয় সব হিন্দু মাইয়া লোকগো ধইর্যা ধইর্যা নিকা কর, বুড়া-গুড়া মানিস না... দ্যাশের ভালো ভালো মৌলবীরা পর্যন্ত সেই লগে মাথা নাড়ে... কমু কি?... না মা আপনে চইল্লা যান... গ্রামের পনেরো আনি লোকে ওরা হাত কইর্যা ফ্যালাইছে টাকা দিয়া। পারলে আপনি আইজি চইল্লা যান।"[৮] বিন্দুবাসিনী বাড়ি-ঘর-জায়গা-জমি ফেলে, ঘরের সমস্ত জিনিস-পত্র রেখে, পুত্র বধু ও নাতনীদের নিয়ে, পূর্ব পাকিস্থানের কুল ছেড়ে ভারতবর্ষ নামক আর এক কূলে উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সোনা-গয়না, টাকা-পয়সা সঙ্গে যা কিছু ছিল, সব পথে হারিয়ে, একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে, তারা শুধুমাত্র জীবন টুকু নিয়ে নতুন দেশের মাটিতে পা রাখে। যে দেশে বাস করবে বলে, তারা স্বপ্নের আলো দু-চোখে দেখেছিল। যে দেশের মাটিতে তারা নিশ্চিন্ত, নিরাপদে বাস করবে ভেবেছিল। যে দেশের মাটিতে আর তাদের বাস্তু হারা হতে হবে না, বলে মনে করেছিল। যে দেশে আর মুসলমানের ভয় নেই বলে তারা বিশ্বাস করেছিল। যে দেশকে তারা নিজের বলে মনে করেছিল। সেই দেশের মাটিতেই সন্যাসীর বেশে স্ব ধর্মের মানুষরা যে মৃত্যু ফাঁদ পেতে রেখেছিল, তা কী তারা ভাবতে পেরেছিল? আশ্রয়হীন, প্রায় নিরন্ন, খোলা আকাশের নীচে বাস করেও, এই উদ্বাস্তু মানুষের বিশ্বাস ছিল যে, এক দিন সুখের সময় আসবে। শত কষ্ট, শত অভাবের মধ্যেও তাদের ধারণা ছিল, এক দিন তারা ঘুরে দাঁড়াবে। এই সময় একদল মানুষ উদ্বাস্তু মানুষের সংকটের সুযোগ মিয়ে, তাদের অসহায়তাকে কাজে লাগিয়ে, তাদের বিশ্বাস ও দুর্বলতাকে ব্যবহার করে,নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য, নিজেদের উদ্দেশ্য পুরণের জন্য, নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য, ভালো মানুষের মুখোশ পরে, সন্যাসীর ভেক ধারণ করে, গভীর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের জাল বিছিয়ে, সরল ও অসহায় মানুষগুলোর জীবনকে মৃত্যু নামক নরক যন্ত্রণার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। কেশবানন্দ সেই শ্রেণীর প্রতিনিধি। এই শ্রেণীর মানুষেরা, তাদের পোষাককে আস্থা, আচরণকে কৌশল ও প্রতিশ্রুতিকে ছলনার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছিল, কেশবানন্দ তাদেরই দলপতি। কেশবানন্দের সন্যাসীর গেরুয়া পোষাক দেখে বিন্দুবাসিনীর পরিবারটি তার প্রতি আস্থা রেখেছিল। কেশবানন্দের শান্ত ও সংযমি আচরণে, তারা ভরষা পেয়েছিল, তার প্রতিশ্রুতিকে, ঈশ্বর প্রেরিত দূত বলে মনে করে, বিশ্বাস করেছিল। তাই বনগাঁয়ের আম বাগানের খোলা আকাশের অনিশ্চিৎ আস্তানা ছেড়ে, কেশবানন্দের "অবলা বান্ধ সমিতি" নামক নিশ্চিন্ত আশ্রয় চলে যেতে চয়েছিল। তারা জানতো না যে তাদের জন্য কোন্ মৃত্যু ফাঁদ অপেক্ষা করে আছে। নতুন দেশে আসার পর, বিন্দুবাসিনীর ছোটো নাতনী বুলু, পথশ্রমে, খাদ্যাভাবে ও খোলা আকাশের নীচে থেকে জ্বরে পরে ও অল্প সময়ের মধ্যে তার মৃত্যু হয়,

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

অবলা বান্ধব সমিতিতে পৌঁছেই। কেশবানন্দ পুত্র বধূ উত্তরাকে চাকরি দেওয়ার নাম করে, তাকে বৃদ্ধকামুক নারীলোলুপ, কামাসক্ত রাজীবলোচনের কাছে বিক্রি করে দেয়। বড়ো নাতনী মিলুকে কেশবানন্দ তার বন্ধু শশীশেখরের ভোগের আগুনে আহুতি দেয়। আর বিন্দুবাসিনীকে জিপ গাড়ি করে নিয়ে গিয়ে, কোলকাতা শহরের একপ্রান্তে পৌঁছে, চলন্ত গাড়ি থেকে ধাক্কা মেতে ফেলে দেওয়া হয়.কেশবানন্দের মতো মানুষেরা মানুষের জীবন নিয়ে আনন্দ উৎসব করে। তার কথায়, "রিফিউজিরা এসেই আরো সুবিধা হয়েছে। বোকাগুলো, বাঙালগুলো, ওদের ভোলাতে যদি এক দাঁতের বুদ্ধিও খরচ করতে হ`য, একটু মিষ্টি কথা বল্লেই, কেমন নির্ভর করেই বিশ্বাস করে। উদাস উদ্ভ্রান্ত চোখে কেমন পায়ে পায়ে চলে আসে, নতুন আশায় আলোকিত হয়ে। নির্বোধ, এদের এই হবে, এই হওয়া উচিৎ। এই তো উত্তরা একত্রিশ বছরের আটোসাটো জোয়ান মেয়ে, কালো হলে কী হয়, কী সুন্দর কী লাবণ্য। যেন উনিশ বছরের যুবতী, এলো তো, অচেনা বলে কতটুকু দ্বিধা করলো সে... আর কেশবানন্দ, রিফিউজিদের যিনি আশ্রয়দাতা, ত্রাণকর্তা, কেমন অকাতরে আহুতি দিয়ে এলো তাকে, শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন সরকারের কামনার যজ্ঞে।"[৯] আসলে, বিন্দুবাসিনীর মতো পূর্ববঙ্গের স্বচ্ছল স্বচ্ছন্দে থাকা পরিবারগুলি, শুধুমাত্র হিন্দু হওয়ার অপরাধে আজন্মের নিশ্চিৎ নিরাপদের আশ্রয়স্থল ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। তাদের দৃড় বিশ্বাস ছিল, ওপারে, হিন্দুস্থানে পৌঁছতে পারলে, ধর্মীয় হানাহানির হাত থেকে তারা রক্ষা পাবে। অনিশ্চিৎ জীবনে ফিরে আসবে নিশ্চয়তা, আর্থিক অভাব হয়তো থাকবে, কিন্তু আশঙ্কাকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিদিন বেঁচে থাকতে হবে না। এ দেশের মানুষ তাদের স্বজাতি ও স্বধর্মের হলেও তাদের নিষ্ঠরতা, স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে বিন্দুবাসিনীর মতো উদ্বাস্তু পরিবারগুলি ছিল অনভিজ্ঞ। তাদের সরলতা, দুর্বলতা ও অসহায়তার সুযোগ নিয়ে, এদেশের এক শ্রেণীর কেশবানন্দের মতো মানুষ,তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল, কিভাবে বিন্দুবাসিনীর মতো উদ্বাস্তু পরিবারগুলি দু-কূল হারিয়ে মৃত্যুর কাছে চির আশ্রয় নিল, তারই পূর্ণাঙ্গ বিবরণের কাহিনী, এই দু-কূল হারা গল্পটি।

একটি তুলসী গাছের কাহিনী

ছোটো গল্পকার ওয়ালিউল্লাহ দেশ ভাগের সমসাময়িক সময় ও দেশ ভাগের পরবর্তী সময়কে, তার একটি তুলসী গাছের কাহিনী ছোটোগল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরে নির্মোহ দৃষ্টিতে, জীবন্তরূপে চিত্রিত করেছেন। দেশ ভাগ, শুধু পূর্ব বঙ্গের সংখ্যা লঘু মানুষের জীবনে অকাল কালবৈশাখির ঝড় আনে নি। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সংখ্যা লঘু মানুষের জীবনে দেখা দিয়েছিল, অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার অভাব। এ দেশের অসংখ্য মুসলমান ধর্মের মানুষ, তাদের চির পরিচিত বাসস্থান ছেড়ে পূর্ববঙ্গে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এই সমস্ত ছিন্নমূল মানুষ, সব কিছু হারিয়ে, শুধু ধর্মগত সাদৃশ্যকে পাথেয় করে, একটি নতুন দেশকে নিজের দেশ হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। কোলকাতা শহরের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন পেশায় কাজ করা, একদল উদ্বাস্তু যুবক পূর্ববঙ্গে পৌঁছনোর পর, তাদের জীবনে আশ্রয়হীনতা, অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠা। তারা একটি ফাঁকা

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

বাড়ী খুঁজে পায় এবং সদলবলে সেই বাড়ীটা দখল করে। অল্প সময়ের মধ্যে বুঝতে পারে যে, এই বিশাল বাড়ীটা কোনো এক হিন্দু পরিবারের। হয়তো তারা দেশ ভাগের কারণে, নিরাপত্যার কারণে, সর্বস্বান্ত হয়ে, বাড়ী ছেড়ে, দরজায় তালা দিয়ে, তাদেরই মতো দেশত্যাগী হয়েছে। বাড়ীটিতে পূর্ববর্তী অধিবাসিদের স্মৃতি স্বরূপ সিঁড়ি থেকে ওঠার সময়, দেয়ালের গায়ে কাঁচা হাতে লেখা "ক" অক্ষরটি জ্বল জ্বল করছে। তারা সদল বলে বাড়ীটির দখল নিল, অসংখ্য জনস্রোতের মতো উদ্বাস্তুদের হাত থেক বিশাল বাড়ীটিকে রক্ষা করল, তারা তাদের পূর্ব জন্মের আস্তাকুড়ের আবর্জনাময় জীবনকে মুছে ফেলে, নতুনভাবে বাকি জীবনটাকে কাটাতে চেয়েছিল। তারা দেশ ত্যাগের কষ্ট, অনিশ্চিৎ জীবনের যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে, বাড়ীটিকে ঘিরে নতুন স্বপ্ন দেখতে লাগল। বাগানময় বিশাল বাড়ীটার বড়ো বড়ো ঘর,অতীতের গ্লানিময় জীবন থেকে সৌভাগ্যের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে নিয়ে এসেছিল, বলে তাদের বিশ্বাস। "খোলা-মেলা ঝকঝকে-তকতকে এই বাড়ী, তাদের মধ্যে একটি নতুন জীবন সঞ্চার করেছে যেন। এদের অনেকেই কোলকাতার ব্লকম্যান লেনে, খালাসি পট্টিতে, বৈঠকখানায়, দপ্তরিদের পাড়ায় সৈয়দ সালেহা লেনে তামাক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে... অকথ্য দুর্গন্ধ নোংরার মধ্যে দিন কাটিয়েছে। তুলনায় এ বাড়ীর বড়ো বড়ো কামড়া, নিল কুঠিরের দালানের প্যাশানে মস্ত মস্ত জানলা, খোলা-মেলা উঠান, আরো পেছনে বন জঙ্গলের মতো আম জাম কাঁঠালের বাগান, এ সব একটি ভিন্ন দুনিয়া যেন... এতো আলো বাতাস কখন তারা উপভোগ করে নাই। তাদের জীবনে সবুজ তৃণ গজাবে, ধমনিতে সতেজ সজীব রক্ত আসবে... দেহ ম্যালেরিয়া কালাজ্বর মুক্ত হবে।"[১০] মতিন, কাদের, ইউনুস, মোদাব্বের, মকসুদ এনায়েতের মতো উদ্বাস্তু সর্বহারা মানুষগুলো ভেবেছিল, দেশভাগ তাদের জীবনে আশির্বাদ বয়ে এনেছে। তারা তাদের অপুর্ণ ইচ্ছগুলিকে বাড়ীটাকে ঘিরে, সবাই মিলে প্রকাশ করতে থাকে। সরকার বাড়ীটিকে অধিগ্রহণ করলে, এই মানুষগুলোকে ছিন্নমূল অবস্থায়, উদ্বাস্তু হয় আবার অনিশ্চিৎ ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে পথে বেরিয়ে পরতে হয়। আসলে, রাষ্ট্র, সরকার, দেশ নায়কদের কাছে কী হিন্দু কী মুসলমান কোনো ধর্মের সাধারণ মানুষের প্রতি কোনো রকম সহানুভূতি ছিল না। উভয় রাষ্ট্রের রাষ্ট্র নেতারা, ধর্মকে অবলম্বন করে দেশভাগ করলেও, সাধারণ অসহায় দরিদ্র সর্বহারা ছিন্নমূল আশ্রয়হীন মানুষ সম্পর্কে তারা ছিলেন উদাসীন, নিস্পিহ ও অনুভুতিহীন। আর তাই,মতিনদের মতো দেশত্যাগী উদ্বাস্তু মানুষগুলো, তথাকথিত নিজের দেশে পৌঁছলেও, দেশটি মুসলমানদের জন্য গঠিত হলেও, দেশের শাসন ব্যবস্থা মুসলমানদের হাতে থাকলেও জীবন ধারণের ন্যূনতম সাহায্যটুকু পায় নি। পায় নি, নিশ্চিৎ মাথা গোজার ঠিকানা। আসলে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের সাধারণ দরিদ্র মানুষ, দেশ ভগের ক্ষত বুকে ধার্ণ করে দেশ ছেড়েছে। সামপ্রোদায়িক দাঙ্গায়,তারাই নিজেদের নিকট আত্মীয়দের হারিয়েছে। দেশ ভাগ তাদের সর্বসান্ত করেছে। আসলে দরিদ্র মানুষের কোনো ধর্ম হয় না, তাদের ইচ্ছে মতো যে কোনো কাজে ব্যবহার করা যায়, তাদের আকস্মিক বিপর্যয়ে কার কী এসে যায়? যেমন মতিনদের মতো অসংখ্য উদ্বাস্তু মানুষদের ভবিষ্যতের কথা কেউ ভাবে নি।

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

এই গল্পটির কেন্দ্রীয় পটভূমিকায় প্রধান চরিত্ররূপে আধ হাত উঁচু একটি মঞ্চের উপর ডালপালা মেলে, রয়েছে একটি তুলসী গাছ। যে হিন্দু পরিবারটি এই বাড়ীতে থাকত, তারা হয়তো প্রতিদিন সন্ধ্যায় তুলসী মঞ্চে প্রদীপ জ্বালিয়ে, তুলসী গাছটিকে দেবতার প্রতীকরূপে পূজা করত। এই বিশাল বাড়ীতে সেই পরিবারের জীবন্ত কোনো চিহ্ন না থাকলেও, বাড়ীর পিছনে হিন্দু ধর্মের স্মারকরূপে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে তুলসী গাছটি। হিন্দু পরিবারটি এই বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর, তুলসী মঞ্চে আর প্রদীপ জ্বলেনি, গাছের গোড়ায় দেয়নি কেউ জল। তাই কয়েকদিনের মধ্যে গাছটির সবুজ পাতা খয়েরি হয়ে গিয়েছিল। গাছের গোড়ায় জমেছিল আগাছার স্তুপ। বাড়ীটা তারা দখল করেছিল, তারা ধর্মের দিক থেকে সবাই মুসলান। বাড়ীটা স্পষ্টই হিন্দুদের হলেও হিন্দু ধর্মের কোনো জীবন্ত চিহ্ন বাড়ীটার কোথাও ছিল না। যে রবিবার সকালে মোদাব্বের তুলসী গাছটিকে দেখল ও দেখামাত্র চিৎকার করে সকলকে ডেকে গাছটিকে কেটে ফেলার আদেশ দিল। সেখানে সবাই উপস্থিত হলেও, কেউ মোদাব্বের কথা এগিয়ে এসে তুলসী গাছটিকে কাটল না। বরং ইউনুস বলে যে,থাক, সদ্দি কাশিতে ওর পাতা কাজে লাগবে। এনায়েত সাত্ত্বিক মুসলান হলেও, গাছটা সমূলে উপড়ে ফেলার কোনো উদ্যোগ তার মধ্যেও দেখা যায় নি। "কী ব্যাপার? চোখ খুলে দেখ, কী? কী দেখব? সাপ খোপ দেখবে আশা করেছিল বলে, প্রথমে তুলসী গাছটা নজরে পরে না তাদের। দেখছ না? এমন বেকায়দা আঁখরাধীন তুলসী গাছটাকে দেখতে পাচ্ছ না? উপড়ে ফেলতে হবে ওটা। আমরা যখন এ বাড়ীতে এসে উঠেছি, তখন এখানে আর কোনো হিন্দুয়ানির চিহ্ন আর সহ্য করা হবে না। একটু হতাশ হয়ে তারা তুলসী গাছটির দিকে তাকায়। গাছটি কেমন যেন মরে আছে, গায়ে সবুজ রঙের পাতায় খয়েরি রঙ ধরেছে নীচে আগাছাও গজিয়েছে, হয়তো বহু দিন তাতে পানি পরে নি। কী দেখছ? মোদাব্বের হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। বলছি না উপড়ে ফেল, এরা কেমন স্তব্ধ হয়ে থাকে। আকস্মিক এ আবিষ্কারে, তারা যেন কিছুটা হতভম্ব হয়ে পরেছে। যে বাড়ী এতো শূন্য মনে হয়েছিল, ছাদে যাওয়া সিঁড়ির দেওয়ালে কাঁচা হাতের লেখা কটা নাম থাকা সত্বেও যে বাড়ীটা বেওয়ারিশ থেকে ছিল, সে বাড়ীর চেহারা হঠাৎ যেন বদলে গেচে। আচমকা ধরা পরে গিয়ে, শুষ্কপ্রায় মৃতপ্রায় নগন্য তুলসী গাছটি, হঠাৎ সে বাড়ীর অন্দরের কথা প্রকাশ করেছে যেন। এদের অহেতুক স্তব্ধতা লক্ষ্য করে মোদাব্বের আবার হুংকার ছাড়ে, ভাবছ কী অতো, উপড়ে ফেল বলছি। কেউ নড়ে না। হিন্দু রীতি নীতি এদের তেমন ভালো করে জানা নাই। তবু কোথাও শুনেছে যে, হিন্দু বাড়ীতে প্রতি দিনান্তে গৃহকত্রী তুলসী গাছের তলে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালায়। গলায় আঁচল দিয়ে প্রনাম করে, আজ যে তুলসী গাছের তলে ঘাস গজিয়ে উঠেছে, সে পরিত্যক্ত তুলসী গাছের তলেও প্রতি সন্ধ্যায় কেউ প্রদীপ দিত। .. সে আজ কোথায়."[১১] আমাদের সমাজে এমন এক শ্রেণীর কতিপয় মোদাব্বরের মতো ধর্মীয় বিদ্বেষ জাগানো মানুষ আছে, যারা ধর্মীয় গোঁড়ামীকে কাজে লাগিয়ে, ধর্মের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তুলতে চায়। যারা পরধর্ম অসহিষ্ণু, যাদের উদ্দেশ্য অন্যের ধর্মের সকল চিহ্ন মুছে ফেলে নিজের ধর্মের বিস্তার ঘটানো, তার জন্য তারা মানুষ হত্যা করতে দ্বিধা বোধ করে না। আর তার পরিণতি সাম্প্রোদায়িক দাঙ্গা।অথচ বেশিরভাগ মানুষ এই তুচ্ছ ধর্মীয় বিভাজনকে বিশ্বাস

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

করে না। তারা নিজের ধর্মকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে, অপরের ধর্মকে স্বীকার করে, সম্মান ও শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি চিরকাল বাস করতে চায়। মোদাব্বের ছাড়া বাকি সকলের নীরবতা, সেই সত্যকে প্রকাশ করে। শুধু তাই নয়. এদের মধ্যে কেউ কেউ গোপনে তুলসী গাছটির গোড়া থেকে আগাছা সরিয়ে, গাছটিকে জল দিয়ে, গাছটিকে পুনরায় জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা করল। এটাই তো প্রকৃতপক্ষে পরধর্ম সহিষ্ণুতার উদাহরণ.ধর্মে ভিত্তিতে দেশ ভাগ, ধর্মের কারণেই সাম্প্রোদায়িক দাঙ্গা, ধর্মের জন্যই পূর্ব বঙ্গের হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা পূর্ববঙ্গে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। পূর্ববঙ্গের একটি ফাঁকা বাড়ীতে, তুলসী গাছকে আশ্রয় করে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঘটনা ঘটতে দেখা গেল, তা আমাদের মজ্জাগত, ঐতিহ্যগত ও শাশ্বত একতারই দৃষ্টান্ত। মতিনরা বাড়ীটা ছাড়তে বাধ্য হলে, জল না পেয়ে, যত্নের অভাবের তুলসী গাছটা আবার শুকিয়ে যেতে লাগল। আসলে, ধর্ম শুধু মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে না, ধর্ম মানুষকে ধারণ করতে শেখায়। মানুষ ছাড়া ধর্ম অস্তিত্বহীন, ঠিক যেন তুলসী গাছটির মতো।

References

১. নরেনদ্রনাথ মিত্র, পালঙ্ক গল্পমালা পঞ্চম খণ্ড, আনন্দপাবলিশার, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা-২৫৫
২. তদেব, পৃষ্ঠা-২৫৯, ৩. তদেব, পৃষ্ঠা-২৬১
৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২৬২
৫. প্রবোধকুমার সান্যাল, অঙ্গার অঙ্গার ছোটোগল্প সংকলন, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৪৩ পৃষ্ঠা-৩১
৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৫
৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৮
৮. প্রতিভা বসু, দুকূল হারা ছোটো গল্প সমগ্র, দেজ ২০১৬ পৃষ্ঠা-৮৮
৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৯১
১০.সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, একটি তুলসী গাছের কাহিনী দুই তীর ও অন্যান্য গল্প,প্রতীক, ১৯৬৫, পৃষ্ঠা-৪৮
১১. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৫

গন্থপঞ্জী

১. আবদুল মকসুদ, সৈয়দ। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ জীবন ও সাহিত্যকর্ম। প্রথমা। ২০১৪।
২. ওয়ালীউল্লাহ, সৈয়দ। দুই তীর ও অন্যান্য গল্প। প্রতীক প্রকাশনী। ১৯৬৫।
৩. বসু, প্রতিভা। ছোটোগল্প সমগ্র। দেজ। ২০১৬।
৪. দাস, ডঃ সুব্রতকুমার। নরেনদ্রনাথ মিত্র। জীবন ও সাহিত্য। মিত্রম্। জানুয়ারী ২০০৯।
৫. মিত্র, নরেনদ্রনাথ। গল্পমালা। আনন্দ। ১৯৭৫।
৬. সান্যাল, আশীসকুমার। প্রবোধকুমার সান্যাল। সাহিত্যসংসদ। ১৯৮৮।
৭. সান্যাল, প্রবোধকুমার। অঙ্গার ছোটোগল্প সংকলন। মিত্র ও ঘোষ। ১৯৭৩।